আজকের প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদকে পরাজিত করতেও চাই কমিউনিটির ইস্পাত কঠিন ঐক্য

রাজনউদ্দীন জালাল

বর্ণবাদ বিরোধী এবং ফ্যাসীবাদ রুখে দেওয়ার সংগ্রামের বর্ষপঞ্জীতে 'আলতাব আলী দিবস' খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। এ বছর আলতাব আলী হত্যাকাণ্ডের ৩৭তম বার্ষিকী। এই ঘটনার সূত্র ধরেই পূর্ব লন্ডনের বাঙ্গালিরা বর্ণবাদ বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং ১৯৭৮ সালের 'ব্যাটল অব ব্রিক লেন' এর সূচনা হয়েছিল। বাঙ্গালিরা সফলভাবে তাদের এলাকাকে রক্ষা করেছে এবং ন্যাশনাল ফ্রন্টের মতো বর্ণবাদী ফ্যাসিস্ট পার্টিকে পরাজিত করেছে, যাদের সদর দফতর ছিল শোরডিচ/হক্সটনে। যেখান থেকে তারা 'স্কিনহেড' গুন্ডাদের পাঠাতো ব্রিকলেনে বাঙ্গালিদের ওপর হামলার জন্য।

বর্ণবাদ এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সূচনা

যুক্তরাজ্যে বাঙ্গালি কমিউনিটি সম্পর্কে ব্যাপক পরিসরে খুব বেশি মানুষ জানতেন না। কিন্তু ১৯৭৮ সালের মে মাসে বর্ণবাদী হামলায় আলতাব আলীর নিহত হওয়ার ঘটনা এবং এর জের ধরে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর ব্রিটেনে বাঙ্গালীদের অবস্থান সবার নজর কাড়ে। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বাঙ্গালিদের প্রথম মিছিলের সূচনা হয় সেইন্ট মেরিজ চার্চ প্রাঙ্গন থেকে। মিছিলটি সেখান থেকে বেরিয়ে সেন্ট্রাল লন্ডন ঘুরে হাইড পার্কে গিয়ে সমাবেশ করে। এরপর ফেরার পথে মিছিলটি দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেয়। এই প্রথম দশ হাজারের বেশি বাঙ্গালি এরকম কোন প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেন। এই মিছিলে সমর্থন দেয়া নানা বর্ণবাদ বিরোধী সংগঠন, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন এবং এন্টি-নাৎসী লীগ। যেসব শ্লোগান সেই মিছিলে দেয়া হয়েছিল তাতে সেসময়ের মানুষের ক্ষোভ, অনুভূতি আর তাদের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন ছিল।

এরকম কয়েকটি শ্লোগান ছিল;

এখানেই থাকবো, এখান থেকেই চলবে লড়াই।
আত্মরক্ষায় লড়াই অপরাধ নয়।
পুলিশি নৃশংসতার অবসান চাই।
সাদা কালো এক হও, এক সঙ্গে লড়াই কর।
আমরা কি চাই? আমরা চাই এক্ষুণি ন্যায় বিচার।
ন্যাশনাল ফ্রন্টকে গুঁড়িয়ে দাও।

বর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রামের সামনের কাতারে বাঙ্গালি তরুণরা

১৯৭৮ সালে এই 'ব্যাটল ফর ব্রিক লেনে' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল বাংলাদেশ ইয়ুথ মুভমেন্ট (বিওয়াইএম)। ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন পরবর্তী বছরগুলোতেও বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের ঝান্ডা হাতে ছিল সামনের কাতারে। বিওয়াইএম এর জন্ম এশিয়ান স্টাডিজ সেন্টারে। বাঙ্গালিদের সভা-সমাবেশের বেশিরভাগই তখন হতো এই এশিয়ান স্টাডিজ সেন্টারে। ব্যারিস্টার লুৎফর রহমান শাহজাহান ছিলেন এর নেতৃত্বে। এই সংগঠনটি আরও দুটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল, যারাও বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে এবং বাসস্থানের অধিকার এবং পুলিশের জবাদদিহিতার দাবিতে আন্দোলনে বড় ভূমিকা রাখে। টাওয়ার ব্রিজের কাছে সাত নম্বর ক্রিসেন্ট ইন মাইনরিস টিওসিএইচ হোস্টেল তখন আশ্রয়হীন বাঙ্গালিদের থাকার ব্যবস্থা করে দিত। এই হোস্টেল চালাতেন পিটার ইস্ট, যিনি ছিলেন লুৎফুর রহমান শাহজাহানের বন্ধু। এছাড়া আরেকটি সংগঠন ছিল বেঙ্গলি হাউজিং একশন গ্রুপ (বিএইচএজি), যারা আশ্রয়হীন বাঙ্গালিদের পক্ষে স্কোয়াটিং মুভমেন্ট চালাতো। কোন বর্ণবাদী হামলা হলে তা শারীরিকভাবে প্রতিরোধেও এরা এগিয়ে আসতো তাদের বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে। এই গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্যে ছিলেন টেরি ফিটজপ্যাট্রিক, মালা ধোন্ডি, ফারুক ধোন্ডি, নুরুল হক, আনওয়ারা হক, খসরু হক, আবদুস সোবহান গেদু এবং রহিম বখত।

তরুণ বাঙ্গালি কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব করতে টাওয়ার হ্যামলেটস ল সেন্টার এক বড় ভূমিকা রাখে। এই সংগঠনটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বর্ণবাদী হামলার শিকার ব্যক্তিদের জন্য ২৪ ঘন্টার এক 'হেল্প লাইন' স্থাপন করেন। এই সংস্থার মাধ্যমে আইনগত সহায়তা দেন নিক ওয়াকার, মিঠু ঘোষ এবং জামাল হাসান। বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের জন্য বাঙ্গালি কর্মী সংগ্রহের লক্ষ্যে আরেকটি ঘাঁটি স্থাপন করা হয় ৩৯, ফোর্ণিয়ের স্ট্রিটের বেজমেন্টে। এটি ছিল একটি ফ্রি-হোল্ড কমিউনিটি সেন্টার, যা কিনে নিয়েছিলেন প্রবীণ বাঙ্গালিরা। বাংলাদেশ ইয়ুথ এসোসিয়েশন এই বাড়ীটি ব্যবহার করতো। এই গ্রুপের মূল নেতারা ছিলেন শামসুদ্দীন, আকিকুর রহমান, চমক আলী নুর, আব্বাস আলী, কোরান আলী, মানিক মিয়া এবং রানা মিয়া। এদের তৃতীয় আরেকটি জায়গা ছিল টাওয়ার হ্যামলেটসের পশ্চিম অংশের ক্যানন বারনেট নাইট স্কুল। এখানে যে তরুণরা আসতেন তাদের নির্দেশনা দিতেন আবদুল আজিজ, মরহুম জাফর খান, জন নিউবেগিন এবং মাহমুদুল হক। যদিও এরা কোন সংগঠন গড়ে তোলেননি, তারা বর্ণবাদী হামলার বিরুদ্ধে লড়াই করতেন এবং এলাকা পাহারা দেয়ার জন্য তাদের কর্মীবাহিনী ছিল। তরুণ কর্মীদের মধ্যে ছিলেন দুজন আবদুস সালাম, রুহুল আমিন এবং নেজাবত মিয়া নিয়াজি।

১৯৭৮ সালের গ্রীষ্মকে টাওয়ার হ্যামলেটসে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের স্বর্ণসময় বলা যায়। এসময় বর্ণবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরোধী চলমান আন্দোলন যেভাবে দিন দিন জোরালো হয়ে উঠছিলো তা লন্ডনজুড়ে এমনকি জাতীয় পরিসরেও বর্ণবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে বেশ গতি দেয়। টাওয়ার হ্যামলেটসের বাঙ্গালি তরুণদের সংগঠনগুলো সাউথহল ইয়ুথ মুভমেন্ট এবং ব্রাডফোর্ড ইয়ুথ এসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত হলো। ইস্ট এন্ডের আন্দোলনের সাফল্য অন্যান্য জায়গার আন্দোলনে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছিল। মরহুম তাসাদ্দুক আহমেদ এমবিই, ফখরুদ্দীন আহমেদ এবং আরও কিছু তরুণ নেতার নেতৃত্বে এই ইয়ুথ সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ রইলো। এদের মধ্যে আরও ছিলেন জিয়া উদ্দীন লালা, শোয়েব আহমেদ চৌধুরি, ডা. জাহিদ হাসান, ডা. হারিস আলি, আকিকুর রহমান, চমক আলি নুর, আবদুল বারি, সিরাজুল হক, রফিক উল্লাহ, সোনাহর আলী, কুতুব উদ্দীন, চুনু মিয়া, ফকরুদ্দীন বিলি, শিরিন মোকাদ্দার, কামরুল আহসান জেজে, এনামুল হক, সৈয়দ মিজান, আমি এবং আরও অনেকে। দুজন স্থানীয় বাঙ্গালি মহিলাও বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিতেন। এরা হচ্ছেন আনওয়ারা হক এবং আমেরুন নেসা।

এই আন্দোলনের মুখে টাওয়ার হ্যামলেটসে ন্যাশনাল ফ্রন্টের চরম পরাজয় হয়। বেথনাল গ্রীণ থেকে তাদের প্রধান অফিস সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। তবে তারপরও ভোটে তাদের বাক্সে কিন্তু ভোট পড়া অব্যাহত ছিল।

৭০ দশকের বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন বহু প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ এবং বামপন্থী দলকে এক কাতারে নিয়ে আসে। এই আন্দোলনের নেতারা এক ধর্মনিরপেক্ষ, বহু সংস্কৃতির প্রগতিশীল সমাজে বিশ্বাস করতেন, যেখানে সবার জন্য স্বাধীনতা, সাম্য এবং ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা থাকবে।

বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা

রাস্তার লড়াই যখন থামলো তখন যুব নেতারা এবং যুব সংগঠনগুলো নতুন তাদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে বসলেন। সিদ্ধান্ত হলো ফেডারেশন অব বাংলাদেশ ইয়ুথ অর্গেনাইজেশন গঠনের। দু বছর ধরে অনেক যোগাযোগ আর আলোচনার পর এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হলো। যুববার্তা নামে একটি দ্বিভাষিক নিউজলেটার বের করতো তারা। প্রথমদিকে এটির সম্পাদক ছিলেন শাহাবউদ্দিন আহমেদ বেলাল। এছাড়া এই সংগঠন থেকে চ্যানেল ফোরের জন্য চারটি ডকুমেন্টারিও তৈরি করা হয়।

বিলেতের মিডিয়া এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থায় ততদিনে বাংলাদেশি কমিউনিটির অস্তিত্ব ভালোভাবেই জানান দেয়া গেছে। সরকারের হোম এফেয়ার্স সিলেক্ট কমিটি বাংলাদেশিদের ওপর রিপোর্ট তৈরি করলো। এই রিপোর্ট তৈরিতে টাওয়ার হ্যামলেটস এসোসিয়েশন ফর রেসিয়াল ইকুয়ালিটি এবং ফেডারেশন অব বাংলাদেশি ইয়ুথ অর্গেনাইজেশন্স বড় ভূমিকা রাখে। ততদিনে বাংলাদেশিরা পরিণত হয়েছেন ব্রিটিশ-বাংলাদেশিতে।

ফেডারেশন অব বাংলাদেশি ইয়ুথ অর্গেনাইজেশন্স খুব দ্রুতই একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল। বিভিন্ন সূত্র থেকে তারা তহবিল পেতে লাগলো এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হলো। এটি পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন পেশাজীবিরা। এই সংগঠনের অনেকেই এখন ব্রিটিশ এস্টাবলিশমেন্টের অংশ আর এই আন্দোলনের লক্ষ্য এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই যেন হারিয়ে গেছে।

মূলধারার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

আশির দশকের শুরুতে এবং মধ্যভাগে এই আন্দোলনের কর্মীরা মনোযোগ দিতে শুরু করলেন মূলধারার রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে। বাঙ্গালি কমিউনিটির বিরাট অংশ আগে থেকেই লেবার পার্টিকে সমর্থন করতেন এবং স্বাভাবিকভাবেই এই পার্টির প্রতি তাদের একটা টান ছিল। এসময় লেবার পার্টি যেন একটি প্রাইভেট পার্টির মতো পরিচালিত হতো। অল্প কজন লোক পার্ট চালাতেন, তাদেরই ছিল প্রাধান্য। অনেক বাঙ্গালি লেবার পার্টির সদস্যপদের জন্য আবেদন করেন, কিন্তু তাদের আবেদন গৃহীত হতো না। এদের আবেদনপত্র নাকি ময়লা কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেয়া হতো। আমরা অল্প কজন যদিও সদস্য হতে পেরেছিলাম, তাও সাদা মধ্যবিত্ত কর্মীদের সহায়তায়। এদের মধ্যে ছিলেন ড্যান জোনস, পল বিজলি, জিওফ হোয়াইট, ফিল ম্যাক্সওয়েল, জিল কোভ এবং ববি ম্যাকডাফ। লেবার পার্টিতে যোগ দিতে না পারায় বাঙ্গালি কমিউনিটির অনেকের মধ্যেই ক্ষোভ বাড়ছে। কমিউনিটি একটিভিষ্টরা এর সূত্র ধরে হ্যানবারি স্ট্রীটে এক সভা ডাকেন। এই সভায় 'পিপলস এলায়েন্স অব বাংলাদেশি ইন নাইনটিন এইটি টু' বলে একটা সংগঠন গঠিত হয়। স্থানীয় কাউন্সিল নির্বাচনে এই সংগঠন থেকে

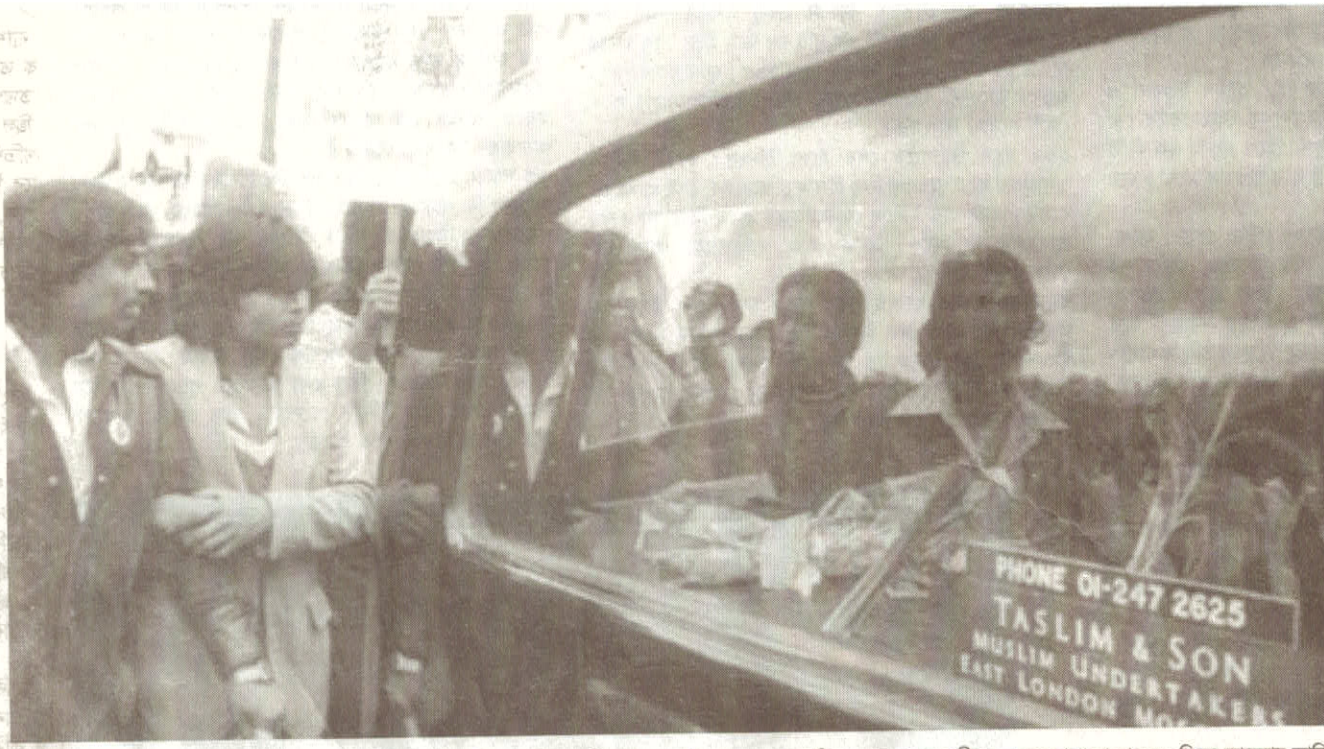

ফিরে দেখা : মে ১৯৭৮। বর্ণবাদীদের হামলায় আলতাব আলি শহীদ হওয়ার পর বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বহু সংস্কৃতির সহাবস্থানের প্রতীক লন্ডনের হাজারো মানুষে। নিহত আলতাব আলির প্রতীকী কফিন নিয়ে ব্রিকলেইন থেকে প্রায় সাত হাজার মানুষের মিছিল ছুটে হাইড পার্ক অভিমুখে। সেখানে প্রতিবাদ সভার পর ১০ ডাউনিং স্ট্রীটে গিয়ে স্মারকলিপি দেন। ছবিতে কফিন নিয়ে বিক্ষোভকারীদের এগিয়ে যাচ্ছেন। এ ঘটনার পর টিকে থাকার সংগ্রামে বাঙালি নেমে আসে রাস্তায়, কেঁপে ওঠে বর্ণবাদীদের ভিত। ছবি : পর ট্রেভর

তিনজন প্রার্থী দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত হয়। এদের একজন নুরুল হক নির্বাচনে জয়ী হন। এবং অপর দুই প্রার্থী সৈয়দ নুরুল ইসলাম এবং রফিকউল্লাহ অল্প ভোটের ব্যবধানে হারেন। এই নির্বাচন টাওয়ার হ্যামলেটসের পলিটিক্যাল এস্টাবলিশমেন্টের কাছে এই বার্তায় পাঠায় যে, বাঙ্গালি কমিউনিটিকে আর উপেক্ষা করা যাবে না। বাঙ্গালিদের একটা বিরাট অংশের সমর্থন তখনো পেয়ে চলেছে লেবার পার্টি। কিন্তু দলের নীতিনির্ধারকরা ধারাবাহিকভাবেই বাঙ্গালিদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত করে চললেন। বাঙ্গালিদের একটি দীর্ঘদিনের দাবি ছিল হাউজ অব কমন্সে টাওয়ার হ্যামলেটসে একজন বাঙ্গালি এমপিকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেয়া। কিন্তু নিউ লেবার নীতি-নির্ধারকরা সেই চিরাচরিত বিভেদ এবং শাসনের খেলায় মেতেছেন এক্ষেত্রেও। তারা কোন বাঙ্গালিকে মনোনয়ন না দিয়ে উপর থেকে অবাঙ্গালি প্রার্থী চাপিয়ে দিয়েছেন বেথনাল গ্রীন এবং বো আসনে।

লেবার পার্টির এই এই 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতি এখনো অব্যাহত এবং এর ফলে বাঙ্গালি কমিউনিটির একটি প্রজন্মের সবচেয়ে ভালো এবং মেধাবীদের লেবার পার্টি হারিয়েছে। লেবার পার্টির বর্তমান বাঙ্গালি কাউন্সিলরদের দিকে তাকান। তাহলেই বুঝতে পারবেন আমি কি বলতে চাইছি। টাওয়ার হ্যামলেটসের লেবার পার্টিকে বিশেষ ব্যবস্থায় রাখা হয়েছে কারণ বাঙ্গালিদের ভোটের ব্যাপারে তারা বিশ্বাস করে না। স্থানীয় পর্যায়েও ব্লেয়ারের লিবারেল ইন্টারভেনশনিজম বলতে পারেন। আমার প্রশ্ন- লেবার পার্টি কবে বাস্তবতাকে মেনে নিতে শিখবে?

বাঙ্গালি কমিউনিটির পরিচয়?

অনেকের মনেই তাদের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন জাগছে। আমরা কি বাঙ্গালি নাকি বাংলাদেশি? আমরা কি প্রথমে বাঙ্গালি নাকি মুসলিম? রাজনৈতিক অবস্থান অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যাখ্যা তুলে ধরছেন। আমি আশা করবো একটা অভিন্ন পরিচয়ের ব্যাপারে আমরা একমত হতে পারবো। আমার মতে আমাদের পরিচয়: বহু সংস্কৃতির ব্রিটেনে আমি একজন ব্রিটিশ-বাংলাদেশি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিক থেকে আমি বাঙ্গালি, আমি বাংলায় কথা বলতে চাই, বাংলা সাহিত্য-গান-নাচ আমি উপভোগ করি, এর জন্য কেউ আমাকে অবিশ্বাসী বলতে পারবে না। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, সেখানেই আমার শেকড়। আমি ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলিম এবং আমি কোন রকম ইসলামবিদ্বেষী হামলার ভয় ছাড়াই ধর্ম পালনের স্বাধীনতা চাই। আমি বিশ্বাস করি ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে মেশানো উচিত নয়।

আমি একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী বাঙ্গালি হতে চাই। একজন মানুষ হিসেবে মানবিক মূল্যবোধ নিয়েই আমি অন্যান্য কমিউনিটির সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সম্পর্ক চাই।

সামনে এগুতে হলে

এটা সত্য আমরা ১৯৭৮ সালের 'ব্যাটল অব ব্রিক লেনের' মাধ্যমে বর্ণবাদ এবং ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হয়েছি। কিন্তু এই বর্ণবাদীরা আবার নতুন এজেন্ডা, নতুন পরিকল্পনা এবং কৌশল নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। তাদের পরাজিত করতে আমরা কি যথাযথ প্রস্তুতি নিচ্ছিল? আমি বিশ্বাস করি বর্ণবাদ এবং ফ্যাসীবাদ বিরোধী আন্দোলনে আমাদের প্রগতিশীল ভ্যানগার্ড দরকার। আমি বিশ্বাস করি সাধারণ মানুষের মধ্যে ইংলিশ ডিফেন্স লীগ বা বিএনপির ব্যাপক সমর্থন নেই। ইডিএল কেবল রাস্তায় নেমে উস্কানি সৃষ্টি করতে পারে, কারণ তারা জানে 'মত প্রকাশের স্বাধীনতার' নামে তাদের সুরক্ষা দেয়া ব্রিটিশ পুলিশের দায়িত্ব। আমাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদকে পরাস্ত করতে হবে, যা আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাপনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সাম্য, স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের জন্য আমাদের মিছিল অব্যাহত থাকবে।

মূল ধারার দলগুলো ইমিগ্রেশনের বীণা বাজিয়ে চলবে। বর্ণবাদকে আড়াল করতে ইসলামোফোবিয়াকে ব্যবহার করবে। কিন্তু আমাদেরকে ১৯৭৮ সালের মতো আজকেও আমাদের নিজেদের শক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং স্বাধীনতার ওপর নির্ভর করতে হবে। বর্ণবাদ এবং ফ্যাসীবাদকে পরাজিত করতে আমাদের একটি ঐক্যবদ্ধ প্রগতিশীল জোট গড়ে তুলতে হবে। এখন আপাত বড় প্রশ্ন - প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদকে পরাস্ত করার সংগ্রামে এবার আমাদের এই মিছিলের সামনে ঝান্ডা হাতে কারা থাকবেন?

রাজনউদ্দীন জালাল
জেনারেল সেক্রেটারি, আলতাব আলী ফাউন্ডেশন